BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/04030015

Available Online: www.bijmrd.com | BIJMRD Volume: 4 | Issue: 03 | March 2026 | e-ISSN: 2584-1890

নীতিমালা থেকে বাস্তবায়ন: পশ্চিমবঙ্গে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সরকারি প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা মূল্যায়ন (মুর্শিদাবাদ জেলার বিশেষ দৃষ্টান্তসহ)

Zinnat Sultana

Independent Research Scholar, Berhampore, West Bengal, India
Email: zsultana880@gmail.com

সারসংক্ষেপ (Abstract):

পশ্চিমবঙ্গে বাল্যবিবাহ একটি গভীর সামাজিক ও উন্নয়নমূলক চ্যালেঞ্জ, যা কঠোর আইনি কাঠামো এবং উদ্ভাবনী জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সত্ত্বেও বিদ্যমান। এই গবেষণাপত্রটি মূলত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুটি ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প— 'কন্যাশ্রী' ও 'রূপশ্রী'-র কার্যকারিতা এবং নীতিমালার মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করে। গবেষণার বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, শর্তাধীন অর্থপ্রদান (Conditional Cash Transfer) মডেলের ফলে মেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার এবং ধরে রাখার ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়লেও, রাজ্যের বাল্যবিবাহের হার জাতীয় গড়ের তুলনায় এখনও উদ্বেগজনকভাবে বেশি।

গবেষণায় মুর্শিদাবাদ জেলাকে একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত (Case Study) হিসেবে গ্রহণ করে দেখা গেছে যে, পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা, চরম দারিদ্র্য, সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তাহীনতা এবং অসংগঠিত বিড়ি শিল্পের অর্থনৈতিক প্রভাব বাল্যবিবাহকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করছে। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৫ (NFHS-5) এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মুর্শিদাবাদে বাল্যবিবাহের হার প্রায় ৫৫.৪%, যা এক বৈপরীত্যমূলক পরিস্থিতির জন্ম দেয়। গবেষণায় একটি 'কৌশলগত আনুগত্য' (Strategic Compliance) লক্ষ্য করা গেছে, যেখানে অভিভাবকরা সরকারি অনুদান পাওয়ার আশায় বিবাহের বয়স ১৮ বছর পর্যন্ত বিলম্বিত করলেও, মেয়েদের উচ্চশিক্ষা বা স্বনির্ভরতার দিকে চালিত করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নথিপত্র জালিয়াতি এবং বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব এই সমস্যার অন্যতম কারণ। এই গবেষণাপত্রটি 'বিবাহ-কেন্দ্রিক' আর্থিক সহায়তা থেকে 'স্বনির্ভরতা-কেন্দ্রিক' মডেলে উত্তরণ, কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং ডিজিটাল নজরদারি বৃদ্ধির সুপারিশ করে। পরিশেষে, বাল্যবিবাহের স্থায়ী নির্মূলের জন্য কেবল আর্থিক প্রণোদনা নয়, বরং একটি আমূল সামাজিক সংস্কার এবং নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন অপরিহার্য।

মূল শব্দ (Keywords): *বাল্যবিবাহ, কন্যাশ্রী প্রকল্প, পশ্চিমবঙ্গ, সামাজিক অন্তরায়, নারী ক্ষমতায়ন, নীতিমালা মূল্যায়ন, মুর্শিদাবাদ কেস স্টাডি।*

১. ভূমিকা (Introduction):

বাল্যবিবাহ কেবল একটি সামাজিক কুপ্রথা নয়, এটি মৌলিক মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন এবং টেকসই উন্নয়নের পথে একটি প্রধান অন্তরায়। রাষ্ট্রসংঘের শিশু অধিকার সনদ (UNCRC) অনুযায়ী, ১৮ বছরের কম বয়সী প্রতিটি মানুষই শিশু, এবং এই বয়সের আগে বিবাহ তাদের শৈশব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জীবনের পূর্ণ সম্ভাবনা বিকাশের সুযোগ কেড়ে নেয়। বিশ্বজুড়ে বাল্যবিবাহের হার হ্রাসের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলেও, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে, বিশেষ করে ভারতে এবং তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে এই সমস্যার প্রকোপ অত্যন্ত গভীর। ভারতের জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৫ (NFHS-5, 2019-21) অনুসারে,

পশ্চিমবঙ্গে ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে প্রায় ৪১.৬% মহিলার বিবাহ ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই হয়ে গিয়েছে, যা জাতীয় গড় (২৩.৩%) অপেক্ষা অনেক বেশি (IIPS & ICF, 2021)। এই পরিসংখ্যানটি নির্দেশ করে যে, কঠোর আইন এবং সরকারি উদ্যোগ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে বাল্যবিবাহের শিকড় অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত। পশ্চিমবঙ্গে বাল্যবিবাহের এই উচ্চ হারের পেছনে একাধিক আর্থ-সামাজিক কারণ দায়ী। প্রথমত, দারিদ্র্য এখানে মূল অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। নিম্নবিত্ত পরিবারগুলিতে কন্যা সন্তানকে অনেক সময় 'আর্থিক বোঝা' হিসেবে গণ্য করা হয় এবং দ্রুত বিবাহ প্রদানের মাধ্যমে সেই দায় থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করা হয়। দ্বিতীয়ত, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার কারণে অল্প বয়সে বিবাহ দেবার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামীণ বা সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কারণে অভিভাবকরা অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়াকে সুরক্ষিত পথ মনে করেন (Das & Saha, 2018)। তৃতীয়ত, শিক্ষার অভাব এবং লিঙ্গ বৈষম্যও বাল্য বিবাহের আরেকটি গুরুত্বপুর্ন কারণ। প্রথাগত পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর ভূমিকা কেবল গৃহকর্ম এবং সন্তান উৎপাদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার মানসিকতা বাল্যবিবাহকে উৎসাহিত করে। কোভিড-১৯ অতিমারী পরবর্তী সময়ে এই সমস্যা আরও প্রকট হয়েছে; স্কুল বন্ধ থাকা এবং পারিবারিক আয় কমে যাওয়ার ফলে বাল্যবিবাহের হার সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে অনেক গবেষক মনে করেন (UNICEF, 2021)।

এই সংকট মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত এক দশকে একগুচ্ছ উদ্ভাবনী এবং প্রভাব বিস্তারকারী প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলো 'কন্যাশ্রী প্রকল্প' (Kanyashree Prakalpa), যা ২০১৩ সালে চালু হয়। এই প্রকল্পের মূল দর্শন হলো আর্থিক সহায়তার বিনিময়ে মেয়েদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা এবং ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বিবাহ বিলম্বিত করা। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ও এস্থার ডুফলোর গবেষণায় দেখা গেছে যে, সরাসরি অর্থ প্রদান (Conditional Cash Transfer) স্কুল ড্রপআউট কমাতে সহায়ক হয়, যা কন্যাশ্রীর মূল ভিত্তি (Banerjee & Duflo, 2011)। এর পাশাপাশি ২০১৮ সালে চালু হয়েছে 'রূপশ্রী প্রকল্প' (Rupashree Prakalpa), যা দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের বিয়ের সময় এককালীন ২৫,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করে, তবে শর্ত থাকে যে কনের বয়স ১৮ বছর হতে হবে।

তবে প্রশ্ন ওঠে এই প্রকল্পগুলির প্রকৃত কার্যকারিতা নিয়ে। একাধারে যেখানে কন্যাশ্রী প্রকল্পের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার আন্তর্জাতিক স্তরে (যেমন: UN Public Service Award, 2017) সমাদৃত হয়েছে, অন্যদিকে NFHS-এর তথ্য অনুযায়ী রাজ্যে বাল্যবিবাহের হার জাতীয় গড়ের তুলনায় দ্বিগুণ থাকা এক বৈপরীত্য তৈরি করে (Mukherjee, 2022)। সমালোচকদের মতে, সরকারি অর্থ সাহায্য অনেক ক্ষেত্রে কেবল বিবাহের বয়সকে ১৮ বছর পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে পারছে, কিন্তু বাল্যবিবাহের মূল সামাজিক কারণগুলো অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা বা মেয়েদের স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এটি কতটা সফল, তা বিতর্কের বিষয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, রূপশ্রী প্রকল্পের টাকা পাওয়ার লোভে অভিভাবকরা ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন, যা নারীর উচ্চশিক্ষা বা কর্মসংস্থানের স্বপ্নকে ব্যাহত করছে।

এই গবেষণাপত্রটির মূল উদ্দেশ্য হলো—নীতিমালা থেকে বাস্তবায়নের এই দীর্ঘ পথে সরকারি প্রকল্পগুলি ঠিক কতটা সফল হয়েছে তা মূল্যায়ন করা। কেন আইনি নিষেধাজ্ঞা (The Prohibition of Child Marriage Act, 2006) এবং বিশাল আর্থিক বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও বাল্যবিবাহের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমছে না? সরকারি তথ্যের বাইরেও যে সব 'লুকানো বাল্যবিবাহ' (Hidden Marriages) ঘটে, সেগুলির প্রকৃতি কী? এই গবেষণায় আমরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তুলনামূলক পরিসংখ্যান ব্যবহার করব এবং তৃণমূল স্তরের বাস্তবতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করব। বাল্যবিবাহ কেবল একটি প্রশাসনিক সমস্যা নয়, বরং এটি একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও কাঠামোগত ব্যাধি। সরকারের গৃহীত বহুমুখী প্রকল্পগুলি কি কেবল লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা (Symptomatic treatment) করছে, নাকি এই ব্যাধির মূলে আঘাত করতে সক্ষম হচ্ছে—সেটিই এই গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য।

২. প্রেক্ষাপট ও সমস্যা (Background and Statement of the Problem):

পশ্চিমবঙ্গে বাল্যবিবাহের সমস্যাটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এটি দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক রীতিনীতি, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা এবং লিঙ্গ বৈষম্যের এক জটিল সংমিশ্রণ। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, গ্রামীণ বাংলার সমাজকাঠামোয় মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়াকে 'পারিবারিক সম্মান' রক্ষার কবচ হিসেবে গণ্য করা হতো। যদিও ১৯২৯ সালের সারদা আইন এবং

পরবর্তীকালে 'বাল্যবিবাহ নিরোধক আইন ২০০৬' (PCMA 2006) কার্যকর করা হয়েছে, তবুও আইনি কঠোরতা সামাজিক মানসিকতাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে পারেনি। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৪ (NFHS-4, 2015-16) থেকে সমীক্ষা-৫ (2019-21) এর তুলনামূলক চিত্রে দেখা যায়, ভারতে সামগ্রিকভাবে বাল্যবিবাহ কমলেও পশ্চিমবঙ্গে এই হার প্রায় স্থিতিশীল বা অত্যন্ত ধীরগতিতে হ্রাস পাচ্ছে (IIPS, 2021)। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ, মালদা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো জেলাগুলোতে এই হার অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

গবেষণার প্রধান সমস্যাটি হলো—রাজ্য সরকারের 'কন্যাশ্রী' ও 'রূপশ্রী'-র মতো জনমুখী প্রকল্পগুলোর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার সত্ত্বেও কেন বাল্যবিবাহের হার কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কমছে না? গবেষণায় দেখা গেছে, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারগুলোতে কন্যা সন্তানকে এখনও 'পরায়া ধন' বা অর্থনৈতিক দায় হিসেবে দেখা হয় (Sarkar, 2020)। অনেক ক্ষেত্রে সরকারি অনুদান পাওয়ার পরেও অভিভাবকরা গোপনে বা ধর্মীয় আচার মেনে বিবাহ সম্পন্ন করছেন এবং ১৮ বছর পূর্ণ হওয়া মাত্রই আইনি নথি দেখিয়ে সরকারি অর্থের দাবি জানাচ্ছেন। একে গবেষকরা 'স্ট্র্যাটেজিক কমপ্লায়েন্স' বা কৌশলগত আনুগত্য বলে অভিহিত করেছেন, যেখানে নীতিমালার আক্ষরিক প্রয়োগ হচ্ছে কিন্তু তার মূল উদ্দেশ্য (বাল্যবিবাহ রোধ) ব্যাহত হচ্ছে (Ghosh, 2019)। তদুপরি, গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারী শ্রমের অভাব এবং কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগ মেয়েদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার (Drop-out) হার বাড়িয়ে দিচ্ছে। ইউনিসেফ (UNICEF, 2020) এর তথ্যমতে, বিদ্যালয়ে পরিকাঠামোর অভাব এবং নিরাপত্তার অভাব অনেক সময় মা-বাবাকে বাধ্য করে মেয়েদের বিয়ে দিতে। কোভিড-১৯ অতিমারীর সময় স্কুল বন্ধ থাকা এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরার ফলে পারিবারিক আয় কমে যাওয়ায় বাল্যবিবাহের প্রকোপ আরও বৃদ্ধি পায়, যা বর্তমান নীতিমালার কার্যকারিতাকে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। সুতরাং, সমস্যাটি কেবল নীতি প্রণয়নের অভাব নয়, বরং নীতিমালার 'বাস্তবায়ন ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার' মধ্যে যে বিস্তর ফারাক রয়েছে, তা চিহ্নিত করাই এই গবেষণার মূল লক্ষ্য।

৩. পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সরকারি প্রকল্পসমূহ (Major Government Initiatives in West Bengal):

পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত এক দশকে বাল্যবিবাহ রোধ এবং নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে একগুচ্ছ জনকল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পগুলোর মূল দর্শন হলো আর্থিক স্বনির্ভরতা এবং শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে মেয়েদের সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় করা। নিচে প্রধান দুটি প্রকল্প—'কন্যাশ্রী' ও 'রূপশ্রী' এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক উদ্যোগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

কন্যাশ্রী প্রকল্প: একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ (Kanyashree Prakalpa)

২০১৩ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে শুরু হওয়া 'কন্যাশ্রী প্রকল্প' বর্তমানে আন্তর্জাতিক স্তরে সমাদৃত। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো মেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আর্থিক উৎসাহ প্রদান করা এবং ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে করার প্রবণতা রোধ করা। এটি একটি 'শর্তাধীন অর্থপ্রদান' (Conditional Cash Transfer) মডেল।

কন্যাশ্রী প্রকল্পের দুটি প্রধান স্তর রয়েছে:

K1 (বার্ষিক অনুদান): ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী ছাত্রীদের (অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী) প্রতি বছর ১০০০ টাকা করে প্রদান করা হয়। এর শর্ত হলো—ছাত্রীকে অবিবাহিত হতে হবে এবং স্বীকৃত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে।

K2 (এককালীন অনুদান): যখন কোনো কন্যাশ্রী প্রাপক ১৮ বছর পূর্ণ করে এবং তখনও পড়াশোনা চালিয়ে যায় (উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক বা ভোকেশনাল), তখন তাকে এককালীন ২৫,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। এর মূল শর্ত হলো—১৮ বছর বয়স পর্যন্ত তাকে অবিবাহিত থাকতে হবে।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, কন্যাশ্রী প্রকল্প কেবল একটি আর্থিক সাহায্য নয়, এটি মেয়েদের মধ্যে একটি 'স্বতন্ত্র পরিচয়' (Independent Identity) তৈরি করেছে। Das (2017) তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে, কন্যাশ্রী প্রকল্পের ফলে গ্রামীণ বাংলায় 'স্কুল ড্রপ-আউট' বা বিদ্যালয় ত্যাগের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। যখন একটি মেয়ে কন্যাশ্রী আইডি পায়, তখন সে নিজেকে রাষ্ট্রের একটি অংশ মনে করে এবং পড়াশোনা শেষ করার এক ধরণের সামাজিক দায়বদ্ধতা অনুভব করে। UNICEF

(2018)-এর এক মূল্যায়ন রিপোর্টে বলা হয়েছে, কন্যাশ্রী প্রকল্পটি মেয়েদের মধ্যে দরকষাকষির ক্ষমতা (Bargaining Power) বাড়িয়েছে, যার ফলে তারা নিজের বিয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পরিবারের সাথে কথা বলার সাহস পাচ্ছে।

রূপশ্রী প্রকল্প: বিবাহের আর্থিক দায়মোচন (Rupashree Prakalpa)

২০১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'রূপশ্রী প্রকল্প' চালু করে। কন্যাশ্রী যেখানে শিক্ষার ওপর জোর দেয়, রূপশ্রী সেখানে বিবাহের সময় দরিদ্র পরিবারের ওপর তৈরি হওয়া আর্থিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। যেসব পরিবারের বার্ষিক আয় ১.৫ লক্ষ টাকার নিচে, তাদের মেয়ের বিয়ের জন্য সরকার এককালীন ২৫,০০০ টাকা প্রদান করে। এই প্রকল্পের প্রধান শর্ত হলো—বিয়ের সময় কনের বয়স ন্যূনতম ১৮ বছর হতে হবে। এটি মূলত বাল্যবিবাহ রোধের একটি আইনি হাতিয়ার হিসেবেও কাজ করে, কারণ এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে গেলে বয়সের প্রমাণপত্র (যেমন বার্থ সার্টিফিকেট বা আধার কার্ড) এবং বিয়ের রেজিস্ট্রেশন বা সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রমাণ দাখিল করতে হয়।

রূপশ্রী প্রকল্পের একটি বড় সমালোচনা ও ইতিবাচক দিক দুই-ই রয়েছে। Chatterjee (2020)-এর মতে, রূপশ্রী প্রকল্প বিয়ের রেজিস্ট্রেশনকে বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বাল্যবিবাহকে নিরুৎসাহিত করছে। যেহেতু সরকারি টাকা পেতে গেলে নথিপত্র পরীক্ষা করা হয়, তাই অনেক অভিভাবক ধরা পড়ার ভয়ে ১৮ বছরের আগে বিয়ে দিতে সাহস পান না। তবে, সমালোচকরা মনে করেন যে এটি ১৮ বছর পূর্ণ হওয়া মাত্রই বিয়ে দিয়ে দেওয়ার প্রবণতাকে উসকে দিচ্ছে, যা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে (Mukhopadhyay, 2021)।

বাল্যবিবাহের সমস্যাটি বহুমুখী, তাই কেবল সরাসরি টাকা দিয়ে এটি বন্ধ করা সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আরও কিছু পরোক্ষ প্রকল্প গ্রহণ করেছে যা নারী ক্ষমতায়নে সহায়ক:

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার: পরিবারের নারী সদস্যের হাতে সরাসরি টাকা দেওয়ার ফলে পরিবারের সামগ্রিক আর্থিক সক্ষমতা বাড়ছে, যা পরোক্ষভাবে মেয়েদের শিক্ষার খরচ মেটাতে সাহায্য করছে।

সবুজ সাথী: ছাত্রীদের সাইকেল প্রদান করার ফলে দূরবর্তী স্কুলগুলোতে যাওয়ার পথে নিরাপত্তা এবং যাতায়াতের সমস্যা মিটেছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, যাতায়াতের সুবিধা বাড়লে মেয়েদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমে, যা বাল্যবিবাহ রোধে সহায়ক (Sen & Ghosh, 2019)।

কমিউনিটি আউটরিচ ও কন্যাশ্রী ক্লাব: প্রতিটি স্কুলে 'কন্যাশ্রী ক্লাব' গঠন করা হয়েছে যেখানে ছাত্রীরা নিজেরাই বাল্যবিবাহের কুফল নিয়ে আলোচনা করে এবং কোনো সহপাঠীর বিয়ে ঠিক হলে প্রশাসনকে জানায়।

যদিও কন্যাশ্রী আন্তর্জাতিক সম্মান পেয়েছে, তবুও এনএফএইচএস-৫ (NFHS-5) এর তথ্য এক ভিন্ন চিত্র তুলে ধরে। IIPS (2021) এর তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৪১.৬% মেয়ের বিয়ে ১৮ বছরের আগে হয়ে যায়। এই বৈপরীত্যের কিছু কারণ নিম্নরূপ:

লুকানো বিবাহ ও নথির কারচুপি: অনেক গ্রামীণ অঞ্চলে ধর্মীয় রীতি মেনে বাল্যবিবাহ দিয়ে দেওয়া হয় এবং ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পর সরকারি প্রকল্পের টাকার জন্য আবেদন করা হয়।

দারিদ্র্যের গভীরতা: ২৫,০০০ টাকা অনেক সময় একটি দরিদ্র পরিবারের জন্য যথেষ্ট নয়, তাই তারা নিরাপত্তার অভাবে দ্রুত বিয়ে দেওয়াকেই শ্রেয় মনে করেন (Sarkar & Roy, 2022)।

সামাজিক সচেতনতার অভাব: কেবল আর্থিক প্রণোদনা দিয়ে শত বছরের পুরনো কুসংস্কার দূর করা সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসন এবং পুলিশের নজরদারি এড়িয়ে বাল্যবিবাহ সংগঠিত হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রকল্পগুলি বাল্যবিবাহ রোধে একটি 'প্যারাডাইম শিফট' বা আমূল পরিবর্তন এনেছে। আগে যেখানে বাল্যবিবাহ ছিল কেবল একটি ব্যক্তিগত বা সামাজিক বিষয়, এখন তা রাষ্ট্রের সরাসরি হস্তক্ষেপের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। Ray (2020) এর

মতে, “The transition from ‘Marriage as a liability’ to ‘Education as an asset’ is the core achievement of these schemes.” তবে প্রকল্পগুলির সফল রূপায়ণের জন্য কেবল টাকা বণ্টন নয়, বরং সামাজিক সচেতনতা এবং আইনি কঠোরতার সমন্বয় একান্ত প্রয়োজন।

8. প্রকল্পের কার্যকারিতা মূল্যায়ন (Evaluation of the Effectiveness of Projects):

পশ্চিমবঙ্গে বাল্যবিবাহ রোধে গৃহীত সরকারি প্রকল্পগুলি, বিশেষ করে ‘কন্যাশ্রী’ ও ‘রূপশ্রী’, গত এক দশকে রাজ্যের সামাজিক ও জনতাত্ত্বিক কাঠামোতে এক উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। তবে এই কার্যকারিতা কেবল সংখ্যাতাত্ত্বিক সাফল্যের মাধ্যমে বিচার করা সম্ভব নয়; এর গভীরতা অনুধাবন করতে হলে শিক্ষা, সামাজিক সচেতনতা এবং আইনি প্রয়োগ—এই তিনটি মাপকাঠিতে বিশ্লেষণ প্রয়োজন। নিচে বিভিন্ন আঙ্গিকে এই প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হলো।

শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও স্কুল ড্রপ-আউট হ্রাস: কন্যাশ্রী প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য ছিল মেয়েদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা। গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১৩ সালের পর থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের রেজিস্ট্রেশনের হার নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। Maitra (2019) তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, কন্যাশ্রী প্রকল্পের বার্ষিক অনুদান (K1) দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের স্কুলের পোশাক, বই এবং যাতায়াতের খরচ মেটাতে সাহায্য করেছে, যার ফলে মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার (Drop-out) প্রবণতা অন্তত ২০-২৫% হ্রাস পেয়েছে। মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র, কারণ শিক্ষিত মেয়েরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন (Sen & Mukherjee, 2020)।

বিবাহের বয়স পিছিয়ে দেওয়ার প্রবণতা: কন্যাশ্রী প্রকল্পের এককালীন ২৫,০০০ টাকা (K2) পাওয়ার শর্ত হলো ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকা। এই শর্তটি গ্রামীণ বাংলার রক্ষণশীল পরিবারগুলোতে এক ধরণের ‘অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা’ তৈরি করেছে। Ghosh & Das (2021)-এর সমীক্ষা অনুযায়ী, অনেক অভিভাবক যারা আগে ১৫-১৬ বছর বয়সেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিতেন, তারা এখন অন্তত ১৮ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করছেন শুধুমাত্র এই এককালীন অর্থ পাওয়ার আশায়। যদিও এটি একটি কৌশলগত পরিবর্তন, তবুও এটি মেয়েদের শরীরের ওপর বয়ঃসন্ধিকালের ধকল কমাতে এবং তাদের মানসিক পরিপক্কতা লাভে সহায়তা করছে।

রূপশ্রী প্রকল্প এবং বিবাহের আইনি স্বীকৃতি: ২০১৮ সালে রূপশ্রী প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে গ্রামীণ অঞ্চলে বিয়ের রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধীকরণের হার বেড়েছে। যেহেতু এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে গেলে বয়সের প্রমাণপত্র এবং বিয়ের নথি দাখিল করতে হয়, তাই প্রশাসনের পক্ষে বাল্যবিবাহ শনাক্ত করা সহজ হয়েছে। Chatterjee (2022) উল্লেখ করেছেন যে, রূপশ্রী প্রকল্প পরোক্ষভাবে ‘বিবাহের বাজার’-এ একটি স্বচ্ছতা এনেছে। আগে যেখানে মৌখিক সম্মতিতে বা ধর্মীয় প্রথায় বাল্যবিবাহ হতো, এখন সরকারি অর্থের লোভে হলেও অভিভাবকরা আইনি পথে হাঁটছেন, যা বাল্যবিবাহের সংখ্যা কমাতে সাহায্য করছে।

সামাজিক ক্ষমতায়ন ও ‘এজেন্সি’ তৈরি: প্রকল্পগুলোর একটি বড় সাফল্য হলো মেয়েদের মধ্যে ‘এজেন্সি’ বা স্ব-কর্তৃত্বের বিকাশ। কন্যাশ্রী ক্লাবগুলোর মাধ্যমে ছাত্রীরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানতে পারছে। Sarkar (2018) তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছাত্রীরা নিজেরাই নিজেদের সহপাঠীদের বাল্যবিবাহ রুখে দিয়েছে এবং ব্লক প্রশাসনকে খবর দিয়েছে। এটি নির্দেশ করে যে, প্রকল্পগুলি কেবল ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নীতি নয়, বরং এটি একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।

*** সীমাবদ্ধতা ও বৈপরীত্য (The Paradox of Success):** এত সাফল্য সত্ত্বেও, ভারতের জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৫ (NFHS-5, 2019-21) এক অস্বস্তিকর সত্য তুলে ধরেছে। পশ্চিমবঙ্গে ২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের ৪১.৬% এখনও ১৮ বছরের আগে বিবাহিত, যা ভারতের অনেক অনগ্রসর রাজ্যের তুলনায় বেশি (IIPS, 2021)। এই বৈপরীত্যের কারণগুলি মূল্যায়ন করলে প্রকল্পের কিছু কাঠামোর দুর্বলতা ধরা পড়ে:

i. ১৮ বছরের 'ডেডলাইন' সমস্যা: রূপশ্রী প্রকল্পের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ১৮ বছর পূর্ণ হওয়া মাত্রই বিয়ের হার প্রচণ্ড বেড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ, মেয়েদের উচ্চশিক্ষা বা কর্মসংস্থানের দিকে নিয়ে যাওয়ার যে লক্ষ্য, তা বিবাহের আর্থিক সাহায্যের চাপে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে (Mukhopadhyay, 2021)।

ii. নথিপত্র জালিয়াতি: গ্রামীণ স্তরে অনেক সময় জাল বার্থ সার্টিফিকেট বা আধার কার্ড ব্যবহার করে বাল্যবিবাহ দেওয়া হচ্ছে এবং পরে সরকারি টাকা তোলা হচ্ছে। স্থানীয় স্তরে দুর্নীতির কারণে প্রকৃত মূল্যায়ন ব্যাহত হচ্ছে।

iii. কোভিড-১৯ এর প্রভাব: অতিমারীর সময় স্কুল বন্ধ থাকায় কন্যাশ্রীর নজরদারি শিথিল হয়েছিল। এর ফলে সেই সময় বাল্যবিবাহের হার সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পায়, যা প্রমাণ করে যে প্রকল্পটি সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংক্রিয় নয়, বরং এটি স্কুল-নির্ভর (UNICEF, 2021)।

পশ্চিমবঙ্গের সব জেলায় এই প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা সমান নয়। মুর্শিদাবাদ, মালদা এবং বীরভূমের মতো জেলাগুলোতে বাল্যবিবাহের হার এখনও জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক উপরে। এর পেছনে রয়েছে ধর্মীয় প্রভাব, পরিযায়ী শ্রমিকের আধিক্য এবং দারিদ্র্য। Ray & Bose (2022) তাঁদের বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে, যেসব জেলায় শিক্ষার মান এখনও উন্নত নয়, সেখানে কন্যাশ্রীর টাকা কেবল বিয়ের পণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। কন্যাশ্রী ও রূপশ্রীর সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে ব্লক এবং পঞ্চায়েত স্তরের প্রশাসনিক সমন্বয়ের ওপর। রূপশ্রী প্রকল্পের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, বিয়ের আগে ভেরিফিকেশন বা সরেজমিনে তদন্ত করার ফলে অনেক বাল্যবিবাহ মাঝপথে আটকানো সম্ভব হয়েছে। তবে আইনি ব্যবস্থার ধীরগতি এবং সামাজিক চাপের মুখে অনেক সময় প্রশাসনিক আধিকারিকরা কঠোর হতে পারেন না (Dasgupta, 2019)।

তবে একথা বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গের সরকারি প্রকল্পগুলি বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী 'প্রতিরক্ষা বলয়' তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এটি মেয়েদের শিক্ষার হার বাড়িয়েছে এবং বিবাহের বয়সকে অন্তত আইনি সীমায় ধরে রাখতে সাহায্য করেছে। তবে কেবল আর্থিক সাহায্য বা শর্তাধীন অর্থপ্রদান (CCT) এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান নয়। দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের জন্য প্রকল্পগুলির সাথে কারিগরি শিক্ষা (Vocational Training) এবং কর্মসংস্থানের সুযোগের নিবিড় সংযোগ ঘটানো প্রয়োজন, যাতে মেয়েরা কেবল 'অবিবাহিত' নয়, বরং 'স্বনির্ভর' হয়ে উঠতে পারে।

৫. সামাজিক ও প্রশাসনিক অন্তরায় (Social and Administrative Barriers):

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কন্যাশ্রী ও রূপশ্রীর মতো যুগান্তকারী প্রকল্প গ্রহণ করা সত্ত্বেও রাজ্যে বাল্যবিবাহের হার জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি থাকা একটি গভীর উদ্বেগের বিষয়। নীতি প্রণয়ন (Policy formulation) এবং তার প্রকৃত বাস্তবায়ন (Implementation)-এর মাঝে যে বিস্তর ব্যবধান বা 'গ্যাপ' রয়েছে, তার পেছনে কাজ করছে বহুমুখী সামাজিক ও প্রশাসনিক অন্তরায়। যেমন-

i. বাল্যবিবাহ কেবল একটি অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, এটি একটি গভীর সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধি। শত বছরের পুরনো রীতিনীতি সরকারি আইনের চেয়েও অনেক ক্ষেত্রে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। গ্রামীণ বাংলার সমাজকাঠামোয় আজও কন্যা সন্তানকে অনেক সময় পরিবারের স্থায়ী সদস্য হিসেবে দেখা হয় না। Sarkar (2020) তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, অনেক অভিভাবক মনে করেন মেয়েদের পড়াশোনায় বিনিয়োগ করার চেয়ে বিয়ে দিয়ে দেওয়া বেশি 'নিরাপদ'। এই পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে মেয়েরা যখনই বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছায়, তখনই তাদের বিয়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। কন্যাশ্রীর টাকা অনেক সময় উচ্চশিক্ষার পরিবর্তে বিয়ের গয়না বা যৌতুকের জন্য জমিয়ে রাখা হয়, যা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব বাল্যবিবাহের একটি বড় কারণ। গ্রামগঞ্জে বা সীমান্তবর্তী এলাকায় স্কুল যাওয়ার পথে ইভটিজিং বা শ্লীলতাহানির ভয় অভিভাবকদের তাড়া করে বেড়ায়। Das & Saha (2018) উল্লেখ করেছেন যে, সামাজিক 'কলঙ্ক' থেকে বাঁচতে এবং মেয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অভিভাবকরা দ্রুত বিয়ে দেওয়াকে একমাত্র সমাধান মনে করেন। এই নিরাপত্তাহীনতা অনেক সময় সরকারি প্রণোদনার চেয়েও বেশি প্রভাবশালী হয়ে দাঁড়ায়। আবার অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় আচার ও প্রথা আইনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় ধর্মীয় গুরু বা পুরোহিত/কাজীদের প্রভাবে ১৮ বছরের

আগেই ধর্মীয় মতে বিয়ে সম্পন্ন হয়। যেহেতু এই বিয়েগুলো অনেক সময় রেজিস্ট্রি করা হয় না, তাই এগুলি সরকারি পরিসংখ্যানে ধরা পড়ে না (Mukhopadhyay, 2021)। একে 'লুকানো বিবাহ' বা 'Silent Marriages' বলা হয়। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের মালদা, মুর্শিদাবাদ ও কোচবিহারের মতো জেলাগুলি থেকে প্রচুর মানুষ ভিন রাজ্যে শ্রমিকের কাজে যান। পরিবার যখন কাজের সন্ধানে বাইরে যায়, তখন বাড়িতে অবিবাহিত মেয়েকে রেখে যাওয়া তারা নিরাপদ মনে করেন না। UNICEF (2021)-এর একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, পরিযায়ী পরিবারগুলোতে বাল্যবিবাহের হার সাধারণ পরিবারের তুলনায় অনেক বেশি, কারণ তারা মেয়েকে দ্রুত 'সুরক্ষিত' করতে চান।

ii. কেবল সামাজিক সমস্যা নয়, সরকারি নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও কিছু প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়। বাল্যবিবাহ রোধে সবচেয়ে বড় প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ হলো বয়সের সঠিক প্রমাণ। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্থানীয় পঞ্চায়েত বা পুরসভা থেকে জালিয়াতির মাধ্যমে বয়সের শংসাপত্র তৈরি করা হয়। Ghosh (2019) তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, অভিভাবকরা কন্যাশ্রী বা রূপশ্রীর টাকা পাওয়ার জন্য অনেক সময় আধার কার্ড বা বার্থ সার্টিফিকেটে বয়স বাড়িয়ে দেন। প্রশাসনের পক্ষে প্রতিটি তৃণমূল স্তরের নথি যাচাই করা সবসময় সম্ভব হয় না। 'বাল্যবিবাহ নিরোধক আইন ২০০৬' (PCMA 2006) অনুযায়ী বাল্যবিবাহ একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, স্থানীয় স্তরে রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রভাবের কারণে পুলিশ প্রশাসন অনেক সময় কঠোর পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করে। বিশেষ করে যখন কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে পুলিশ যায়, তখন স্থানীয়রা অনেক সময় বাধা দেয় বা লুকিয়ে বিয়ে সম্পন্ন করে। Dasgupta (2019)-এর মতে, বাল্যবিবাহের সাথে যুক্ত পুরোহিত বা ঘটকদের শাস্তির আওতায় আনার হার খুবই নগণ্য। বাল্যবিবাহ রোধে শিক্ষা বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ এবং সমাজকল্যাণ বিভাগের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় প্রয়োজন। অনেক সময় স্কুল থেকে কোনো ছাত্রী ড্রপ-আউট হলে সেই খবর ব্লক প্রশাসন বা পঞ্চায়েতের কাছে সঠিক সময়ে পৌঁছায় না। এই 'ইনফরমেশন গ্যাপ'-এর সুযোগ নিয়ে অভিভাবকরা মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। প্রকল্পের নজরদারি ব্যবস্থা অনেক সময় কেবল টাকা লেনদেনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, সামাজিক ফলো-আপের অভাব পরিলক্ষিত হয় (Mukherjee, 2022)। আবার মহামারীর সময় দীর্ঘ সময় স্কুল বন্ধ থাকায় কন্যাশ্রী প্রকল্পের প্রধান নজরদারি কেন্দ্রটি (স্কুল) অকেজো হয়ে পড়েছিল। মিড-ডে মিলের সময় ছাড়া ছাত্রীদের সাথে শিক্ষকদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই সুযোগে বাল্যবিবাহের সংখ্যা আকাশছোঁয়া হয়েছিল। Ray & Bose (2022) উল্লেখ করেছেন যে, অতিমারী পরবর্তী সময়ে প্রশাসনিক নজরদারি আগের অবস্থায় ফিরতে অনেকটা সময় নিয়েছে, যার খেসারত দিতে হয়েছে রাজ্যের কিশোরীদের।

একটি অদ্ভুত প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ হলো কন্যাশ্রী ও রূপশ্রী প্রকল্পের মধ্যেকার লক্ষ্যগত পার্থক্য। কন্যাশ্রী মেয়েকে 'শিক্ষার্থী' হিসেবে দেখতে চায়, আর রূপশ্রী তাকে 'কনে' হিসেবে আর্থিক সাহায্য দেয়। সমালোচকদের মতে, রূপশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার পরোক্ষভাবে বিয়েকেই স্বীকৃতি দিচ্ছে। অনেক দরিদ্র পরিবার মনে করে, মেয়েকে পড়াশোনা করিয়ে কী হবে যদি শেষ পর্যন্ত ২৫,০০০ টাকা বিয়ের জন্যই পাওয়া যায়? এই 'Marriage-centric' মানসিকতা প্রশাসনিকভাবে বাল্যবিবাহকে সম্পূর্ণ নির্মূল করতে বাধা দিচ্ছে (Chatterjee, 2020)।

এই অন্তরায়গুলো দূর করতে হলে কেবল প্রশাসনিক কড়াকড়ি যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন:

a. **কমিউনিটি পুলিশিং:** স্থানীয় মানুষকে নিয়ে নজরদারি কমিটি গঠন করার মাধ্যমে নজরদারি করতে হবে।

b. **ডিজিটালাইজেশন:** জন্ম নিবন্ধন থেকে শুরু করে স্কুল পর্যন্ত একটি সেন্ট্রাল ডেটাবেস তৈরি করা যাতে বয়সের কারচুপি রোখা যায়।

c. **আর্থিক প্রকল্পের সংস্কার:** রূপশ্রীর টাকা বিয়ের পরিবর্তে উচ্চশিক্ষা বা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (Self-Help Group) বিনিয়োগে উৎসাহিত করা।

অর্থাৎ বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গের নীতিমালাগুলো কাগজে-কলমে অত্যন্ত শক্তিশালী হলেও সামাজিক সংস্কার এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতার অভাবে পূর্ণফল দিতে পারছে না। Sengupta (2019) যথার্থই বলেছেন, "বাল্যবিবাহ রোধ কেবল একটি আইনি লড়াই নয়, এটি একটি মানসিক পরিবর্তনের যুদ্ধ।" প্রশাসনের উচিত কেবল টাকা বিলি না করে, কেন বাল্যবিবাহ হচ্ছে সেই মূল কারণগুলোর (Root causes) ওপর আঘাত করা।

৬. মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রসমীক্ষা (Case Study of Murshidabad District):

পশ্চিমবঙ্গের বাল্যবিবাহের মানচিত্রে মুর্শিদাবাদ জেলাটি একটি 'হটস্পট' বা অত্যন্ত সংবেদনশীল এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৫ (NFHS-5, 2019-21) অনুযায়ী, এই জেলায় ১৮ বছরের নিচে মেয়েদের বিয়ের হার প্রায় ৫৫.৪%, যা পশ্চিমবঙ্গের গড় (৪১.৬%) এবং জাতীয় গড় (২৩.৩%) অপেক্ষা আশঙ্কাজনকভাবে বেশি (IIPS, 2021)। নিম্নে মুর্শিদাবাদের বিশেষ ভৌগোলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে সরকারি প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা এবং মাঠ পর্যায়ের চ্যালেঞ্জগুলো বিশ্লেষণ করা হলো।

মুর্শিদাবাদ জেলার জনতাত্ত্বিক গঠন অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। এটি একটি কৃষিপ্রধান এবং পরিযায়ী শ্রমিক অধ্যুষিত জেলা। জেলার একটি বড় অংশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত (বাংলাদেশ) সংলগ্ন। Biswas (2018) তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, সীমান্তবর্তী এলাকায় দারিদ্র্য এবং অনুপ্রবেশজনিত নিরাপত্তাহীনতা অভিভাবকদের দ্রুত মেয়েদের বিয়ে দিতে বাধ্য করে। এছাড়া বিড়ি শিল্পে নারী শ্রমের আধিক্য এই জেলায় বাল্যবিবাহের একটি অন্যতম অর্থনৈতিক কারণ।

মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, মুর্শিদাবাদের ব্লকে ব্লকে কন্যাশ্রী প্রকল্পের ব্যাপক প্রচার রয়েছে।

স্কুল এনরোলমেন্ট: ডোমকল, জলঙ্গি এবং ভগবানগোলা ব্লকের বিভিন্ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের নাম নথিভুক্তিকরণের হার গত পাঁচ বছরে প্রায় ৩০% বেড়েছে। Mondal (2020)-এর মতে, কন্যাশ্রীর বার্ষিক অনুদান (K1) ছাত্রীদের খাতা-কলম এবং যাতায়াতের নূন্যতম খরচ মেটাতে সক্ষম হয়েছে।

রূপশ্রীর আবেদন: মুর্শিদাবাদে রূপশ্রী প্রকল্পের আবেদনের সংখ্যা রাজ্যের মধ্যে অন্যতম শীর্ষে। তবে এখানে একটি 'প্যারাডক্স' লক্ষ্য করা গেছে। অনেক পরিবার মেয়ের বিয়ের অন্তত ১-২ বছর আগে থেকেই সরকারি পোর্টালের দিকে তাকিয়ে থাকে। এটি বিয়ের বয়সকে ১৮ বছর পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে পারলেও, ১৮ বছর একদিন হওয়া মাত্রই বিয়ের পিঁড়িতে বসার হার এই জেলায় সবচেয়ে বেশি (Sarkar & Khan, 2022)।

তবে মুর্শিদাবাদে কাজ করতে গিয়ে গবেষক এবং সমাজকর্মীরা কয়েকটি বিশেষ বাধার সম্মুখীন হয়েছেন:

বিড়ি শিল্প ও শিশু শ্রম: মুর্শিদাবাদের সমশেরগঞ্জ, সুতি এবং ফরাক্কা অঞ্চলে বিড়ি শিল্প অত্যন্ত শক্তিশালী। এখানে ছোটবেলা থেকেই মেয়েরা বিড়ি বাঁধার কাজে লিপ্ত হয়। Khatun (2019) উল্লেখ করেছেন যে, যখন একটি মেয়ে উপার্জনকক্ষম হয়ে ওঠে, তখন পরিবার তাকে দ্রুত বিয়ে দিয়ে দিতে চায় যাতে সেই উপার্জনের অংশটি অন্য পরিবারে স্থানান্তরিত হয় অথবা যৌতুকের দায় মেটানো যায়। এই অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা (অসংগঠিত ক্ষেত্রে) শিক্ষার গুরুত্বকে অনেক সময় কমিয়ে দেয়।

পরিযায়ী শ্রমিক ও 'নিরাপত্তার অভাব': এই জেলার হাজার হাজার পুরুষ কাজের সন্ধানে কেরালা, মহারাষ্ট্র বা সৌদি আরবে যান। বাড়িতে যখন অভিভাবক বা পুরুষ সদস্য থাকেন না, তখন কিশোরী মেয়েদের 'নিরাপত্তা' নিয়ে মা ও দাদারা দুশ্চিন্তায় ভোগেন। Rahman (2021)-এর মাঠ পর্যায়ের সাক্ষাৎকারে দেখা গেছে, অনেক মা বলেছেন, "বাবা বাইরে থাকে, মেয়ে বড় হয়েছে, কোনো দুর্ঘটনা ঘটার আগেই হাত পার করে দেওয়া ভালো।" এই মনস্তাত্ত্বিক ভয় সরকারি আইনের চেয়েও শক্তিশালী।

'লুকানো বিবাহ' এবং নথিপত্রের কারচুপি: মাঠ পর্যায়ে দেখা গেছে, অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় 'নিকাহ রেজিস্টার' বা কাজীদের সহায়তায় বয়সের হেরফের করে বিয়ে দেওয়া হয়। অনেক সময় আঠারো বছর হওয়ার আগে ধর্মীয় মতে বিয়ে হয়ে যায়, কিন্তু মেয়ে বাপের বাড়িতেই থাকে এবং আঠারো বছর পূর্ণ হলে সরকারি টাকার জন্য আবেদন করে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নেয় (Ghosh, 2020)। প্রশাসনের কাছে এটি 'সফল কেস' মনে হলেও বাস্তবে এটি একটি বাল্যবিবাহ।

মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসন বাল্যবিবাহ রুখতে কিছু উদ্ভাবনী পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন-

কন্যাশ্রী যোদ্ধা: অনেক স্কুলে ছাত্রীদের নিয়ে টিম গঠন করা হয়েছে যারা গোপনে বাল্যবিবাহের খবর প্রশাসনকে দেয়। ডোমকল ব্লকের একটি ঘটনায় দেখা গেছে, এক ছাত্রী নিজের বিয়ের কথা বিডিও (BDO) অফিসে ফোন করে জানিয়ে বিয়ে রুখে দিয়েছে (The Hindu, 2022)।

ম্যারেজ হল ও পুরোহিতদের নজরদারি: জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিয়ের হল মালিক এবং পুরোহিত/কাজীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বয়সের প্রমাণপত্র ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না। তবে সীমান্ত এলাকায় এবং প্রত্যন্ত চরাঞ্চলে এই নজরদারি পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়ে।

মাঠ পর্যায়ের তথ্য বলছে, মুর্শিদাবাদে বাল্যবিবাহের সাথে সরাসরি যুক্ত রয়েছে উচ্চ শিশু মৃত্যুর হার এবং কিশোরী মায়েদের স্বাস্থ্যহানি। Health Report (2021) অনুযায়ী, এই জেলায় কম বয়সে গর্ভধারণের হার রাজ্যের মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ। বাল্যবিবাহের ফলে মেয়েরা পুষ্টিহীনতায় ভোগে এবং তাদের গর্ভজাত সন্তানও দুর্বল হয়, যা দারিদ্র্যের চক্রকে (Cycle of Poverty) চিরস্থায়ী করে।

মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মুর্শিদাবাদের জন্য কিছু বিশেষ পদক্ষেপ প্রয়োজন:

a. বিড়ি শ্রমিক পরিবারগুলোর জন্য বিশেষ ভাতা: যেসব বিড়ি শ্রমিক মেয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাবে, তাদের কন্যাশ্রীর বাইরেও অতিরিক্ত ইনসেনটিভ দেওয়া।

b. চর অঞ্চলের জন্য ভ্রাম্যমাণ স্কুল ও কাউন্সিলিং: যেসব এলাকা মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন, সেখানে প্রশাসনিক নজরদারি বাড়ানো।

c. ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের প্রসার: শুধুমাত্র বইয়ের পড়াশোনা নয়, সেলাই, নার্সিং বা কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যাতে বিয়ের বিকল্প তৈরি হয়।

মুর্শিদাবাদের কেস স্টাডি প্রমাণ করে যে, বাল্যবিবাহ কেবল একটি পরিসংখ্যান নয়, এটি দারিদ্র্য এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এক লড়াই। কন্যাশ্রী বা রূপশ্রী এখানে 'অক্সিজেন'-এর মতো কাজ করলেও, রোগের মূলে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন আরও নিবিড় সামাজিক সংস্কার। Islam (2022) যথার্থই বলেছেন, "যতক্ষণ না মুর্শিদাবাদের প্রতিটি গ্রাম মেয়েদের শিক্ষাকে বিয়ের চেয়ে লাভজনক মনে করবে, ততক্ষণ সরকারি টাকা কেবল সাময়িক স্বস্তি দেবে, স্থায়ী মুক্তি নয়।"

৭. সুপারিশ ও সমাধান (Policy Recommendations and Solutions):

পশ্চিমবঙ্গে বাল্যবিবাহের শিকড় কেবল দারিদ্র্যের মধ্যে নয়, বরং গভীর সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে প্রোথিত। এই গবেষণায় দেখা গেছে যে, কন্যাশ্রী বা রূপশ্রীর মতো আর্থিক প্রণোদনা প্রকল্পগুলো সফল হলেও সেগুলি একা বাল্যবিবাহ নির্মূল করতে যথেষ্ট নয়। নীতিমালা থেকে বাস্তবায়নের পথে যে ফাঁকগুলো রয়েছে, তা পূরণে নিম্নলিখিত বহুমুখী সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করা হলো:

a. আর্থিক প্রকল্পের কাঠামোগত সংস্কার (Reframing Financial Incentives): বর্তমানে রূপশ্রী প্রকল্পের অর্থ সরাসরি বিবাহের জন্য দেওয়া হয়, যা অনেক সময় অভিভাবককে ১৮ বছর পূর্ণ হওয়া মাত্রই বিয়ে দিতে উৎসাহিত করে। এক্ষেত্রে রূপশ্রী প্রকল্পের অর্থকে কেবল 'বিবাহ সহায়তা' হিসেবে না রেখে তাকে 'উচ্চশিক্ষা বা স্বনির্ভরতা তহবিল' হিসেবে রূপান্তর করা যেতে পারে। যদি কোনো মেয়ে ১৮ বছরের পর বিয়ে না করে উচ্চশিক্ষা বা পেশাদারী প্রশিক্ষণ (Vocational Training) গ্রহণ করে, তবে তাকে অতিরিক্ত আর্থিক ইনসেনটিভ প্রদান করা উচিত (Chatterjee, 2020)। এছাড়া কন্যাশ্রী (K2) প্রাপকদের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে (MSME) বিশেষ কোটা বা দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণও নিশ্চিত করা যেতে পারে, যাতে তারা পরিবারের ওপর 'আর্থিক বোঝা' হিসেবে গণ্য না হয় (Mukherjee & Das, 2021)।

b. ডিজিটাল নজরদারি ও আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় (Digital Surveillance and Synergy): প্রশাসনিক শিথিলতা এবং নথিপত্র জালিয়াতি রোধে প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। জন্ম নিবন্ধন (Birth Registration), আধার এবং স্কুল ড্রপ-আউট ডেটাকে একটি একক পোর্টালে যুক্ত করতে হবে। কোনো ছাত্রী টানা ১০-১৫ দিন স্কুলে অনুপস্থিত থাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্লক প্রশাসন (BDO) এবং স্থানীয় পঞ্চায়েতের কাছে সতর্কবার্তা (Alert) যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে (Ghosh, 2019)। শিক্ষা বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ এবং পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে নিয়মিত সমন্বয় সভা করতে হবে যাতে কোনো এলাকায় বাল্যবিবাহের প্রবণতা বাড়লে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

c. সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন (Socio-Psychological Shift): বাল্যবিবাহ নিরোধ কেবল একটি আইনি লড়াই নয়, এটি একটি সামাজিক আন্দোলন। প্রতিটি গ্রামে পঞ্চায়েত সদস্য, আশাকর্মী (ASHA), অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং স্থানীয় ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে 'বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করতে হবে। মুর্শিদাবাদ বা মালদার মতো জেলাগুলোতে এই কমিটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (Sarkar, 2022)। বিবাহের ধর্মীয় আচার পালনকারী ব্যক্তিদের (পুরোহিত, কাজী বা ধর্মগুরু) জন্য সরকারি লাইসেন্স বাধ্যতামূলক করা এবং বাল্যবিবাহ দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কঠোর শাস্তির বিধান নিশ্চিত করতে হবে।

d. শিক্ষার মান ও নিরাপত্তার উন্নয়ন (Quality Education and Safety): নিরাপত্তার অভাব এবং নিম্নমানের শিক্ষা অনেক সময় ড্রপ-আউট ও বাল্যবিবাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামীণ এলাকায় স্কুলবাস বা যাতায়াতের সুব্যবস্থা থাকলে ইভটিজিং-এর ভয় কমে, যা অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা লাঘব করে। 'সবুজ সাথী' প্রকল্পের সাইকেল বিতরণ এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে, তবে যাতায়াতের পথে পুলিশি নজরদারি আরও বাড়ানো প্রয়োজন (Sen & Ghosh, 2019)। পাঠ্যপুস্তকে বাল্যবিবাহের কুফল এবং কিশোরী বয়সে গর্ভধারণের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

e. বিশেষ জেলাভিত্তিক পরিকল্পনা (District-Specific Action Plans): মুর্শিদাবাদ, মালদা বা উত্তর দিনাজপুরের মতো 'হাই-বারডেন' জেলাগুলোর জন্য বিশেষ কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজন। যেসব পরিবার কাজের জন্য বাইরে যায়, তাদের কন্যাদের জন্য বিশেষ আবাসিক হোস্টেলের ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে নিরাপত্তার কারণে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন না পড়ে (UNICEF, 2021)। বিড়ি বা ক্ষুদ্র শিল্পে যুক্ত পরিবারগুলোর জন্য বিশেষ সামাজিক সুরক্ষা যোজনা চালু করা প্রয়োজন।

f. আইনি কঠোরতা ও 'জিরো টলারেন্স' (Legal Stringency): 'বাল্যবিবাহ নিরোধক আইন ২০০৬' (PCMA 2006)-এর কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। অনেক সময় রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রভাবে মামলা নথিভুক্ত হয় না। পুলিশ প্রশাসনকে বাল্যবিবাহের অভিযোগ পাওয়া মাত্রই দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে (Dasgupta, 2019)।

বাল্যবিবাহ মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়া কেবল সরকারের একার দায়িত্ব নয়, এটি একটি যৌথ সামাজিক অঙ্গীকার। সুপারিশকৃত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করলে এবং আর্থিক সহায়তার সাথে সামাজিক ও প্রশাসনিক সক্রিয়তার মেলবন্ধন ঘটলে 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প তার প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে—যেখানে প্রতিটি মেয়ে কেবল বিবাহিত নারী নয়, বরং একজন স্বাবলম্বী নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।

৮. উপসংহার (Conclusion):

সুতরাং এই আলোচনা থেকে আমরা একটি অত্যন্ত জটিল সামাজিক ও প্রশাসনিক চিত্র প্রত্যক্ষ করি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত এক দশকে কন্যাশ্রী ও রূপশ্রীর মতো যুগান্তকারী প্রকল্পের মাধ্যমে যে সুরক্ষা বলয় তৈরি করেছে, তা কেবল ভারতেই নয়, বিশ্বজুড়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তবে এই গবেষণার পরতে পরতে যে সত্যটি উন্মোচিত হয়েছে তা হলো—বাল্যবিবাহ কেবল একটি আর্থিক সমস্যা নয়, বরং এটি একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও কাঠামোগত ব্যাধি, যার মূলোৎপাটন কেবল আর্থিক অনুদান বা আইনের ভয় দেখিয়ে সম্ভব নয়। তথ্য ও পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কন্যাশ্রী প্রকল্প নিঃসন্দেহে নারী শিক্ষায় এক নীরব বিপ্লব এনেছে। বিদ্যালয়ের বারান্দায় মেয়েদের উপস্থিতি বৃদ্ধি এবং স্কুল ড্রপ-আউট হ্রাস পাওয়ার ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু মুদ্রার উল্টো পিঠটি হলো এনএফএইচএস-৫ (NFHS-5) এর সেই অস্বস্তিকর পরিসংখ্যান, যা বলছে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৪১.৬% কিশোরী এখনও ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। এই বৈপরীত্য আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, সরকারি নীতিমালা এবং মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতার মধ্যে একটি দীর্ঘ ব্যবধান রয়ে গিয়েছে। মুর্শিদাবাদ বা মালদার মতো জেলাগুলির কেস স্টাডি থেকে আমরা দেখেছি, দারিদ্র্য যখন চরম আকার ধারণ করে এবং যখন নিরাপত্তার অভাব বোধ হয়, তখন অভিভাবকরা সরকারি ২৫,০০০ টাকার চেয়ে মেয়ের 'নিরাপদ ভবিষ্যৎ' (তাদের দৃষ্টিতে বিবাহ) নিশ্চিত করাকেই শ্রেয় মনে করেন।

এই আলোচনার একটি অন্যতম প্রধান পর্যবেক্ষণ হলো—রূপশ্রী এবং কন্যাশ্রী প্রকল্পের লক্ষ্যগত পার্থক্য অনেক সময় হিতে বিপরীত ফল দিচ্ছে। যেখানে কন্যাশ্রী মেয়েকে একজন স্বাধীনচেতা শিক্ষার্থী হিসেবে গড়ে তুলতে চায়, সেখানে রূপশ্রী অনেক সময় ১৮ বছর পূর্ণ হওয়া মাত্রই তাকে 'কনে' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দিচ্ছে। এই 'ম্যারেজ-সেন্ট্রিক' বা

বিবাহ-কেন্দ্রিক মানসিকতা থেকে সমাজকে বের করে আনা বর্তমানে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। বাল্যবিবাহ রোধের লড়াইটি এখন আর কেবল সরকারি দপ্তরের ফাইলবন্দি কোনো বিষয় নয়, এটি এখন প্রতিটি পাড়ায়, প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেওয়ার মতো একটি সাংস্কৃতিক যুদ্ধ।

ভবিষ্যতের দিকে তাকালে আমাদের অনুধাবন করতে হবে যে, বাল্যবিবাহ মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়তে হলে কেবল প্রশাসন বা পুলিশ দিয়ে কাজ হবে না। এর জন্য প্রয়োজন একটি সমন্বিত 'ইকো-সিস্টেম'। আমাদের সুপারিশগুলি থেকে এটি স্পষ্ট যে, আর্থিক সহায়তার সাথে কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং কারিগরি শিক্ষার মেলবন্ধন ঘটানো একান্ত প্রয়োজন। যখন একটি মেয়ে এবং তার পরিবার বুঝতে পারবে যে ১৮ বছর বয়সের পর বিয়ে করার চেয়ে স্বনির্ভর হওয়া বেশি লাভজনক এবং সম্মানজনক, ঠিক তখনই বাল্যবিবাহের হার প্রাকৃতিকভাবেই শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে। ডিজিটাল নজরদারি, পঞ্চায়েত স্তরে কড়া জবাবদিহিতা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক নেতাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এই লড়াইকে আরও বেগবান করতে পারে।

সবশেষে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধের সূচনা করেছে, তার প্রাথমিক ভিত্তিটি অত্যন্ত মজবুত। কন্যাশ্রী প্রকল্প কেবল একটি প্রকল্প নয়, এটি বাংলার লক্ষ লক্ষ মেয়ের আত্মবিশ্বাসের নাম। তবে এই সাফল্যের ওপর আত্মতুষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রতিটি বাল্যবিবাহ একটি কিশোরীর স্বপ্নভঙ্গের গল্প এবং একটি সুস্থ সমাজ গঠনের পথে এক বিরাট অন্তরায়। 'নীতিমালা' যখন কেবল কাগজের পাতায় সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজের প্রতিটি স্তরে 'বাস্তবায়ন' হবে এবং যখন প্রতিটি মেয়ে নিজের বিয়ের সিদ্ধান্তের চেয়ে নিজের ক্যারিয়ারের সিদ্ধান্তকে বেশি গুরুত্ব দিতে পারবে, তখনই এই গবেষণার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে। বাল্যবিবাহ মুক্ত সমাজ গড়ার এই সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হলেও অসম্ভব নয়। প্রশাসনিক সদিচ্ছা, কঠোর আইনি প্রয়োগ এবং সর্বোপরি সামাজিক চেতনার জাগরণ—এই ত্র্যহস্পর্শেই লুকিয়ে আছে বাংলার মেয়েদের প্রকৃত মুক্তি। কন্যাশ্রীর হাত ধরে যে আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত হয়েছে, তাকে উচ্চশিক্ষা ও স্বনির্ভরতার হাওয়ায় আরও প্রদীপ্ত করে তুলতে হবে, যাতে বাল্যবিবাহের অন্ধকার চিরতরে এই রাজ্য থেকে বিদায় নেয়।

তথ্যসূত্র:

- Agarwal, B. (2018). Gender and Land Rights in South Asia. New York, NY: Oxford University Press.
- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2011). Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty. New York, NY: PublicAffairs.
- Biswas, S. (2018). Border Politics and Child Marriage in Murshidabad District. Kolkata, WB: Levant Books.
- Chatterjee, M. (2020). Policy Paradox: Analyzing Kanyashree vs Rupashree in West Bengal. Mumbai, MH: Economic and Political Weekly.
- Das, S. (2017). Empowering the Girl Child: An Assessment of Kanyashree Prakalpa. New Delhi, DL: Sage Publications.
- Dasgupta, D. (2019). Legal Barriers in the Implementation of PCMA, 2006. Siliguri, WB: University of North Bengal Press.
- Dreze, J., & Sen, A. (2013). An Uncertain Glory: India and its Contradictions. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Field, E., & Ambrus, A. (2008). Early Marriage, Age of Menarche, and Female Schooling in Bangladesh. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Ghosh, R. (2019). Conditional Cash Transfers and the Persistence of Early Marriage. New Delhi, DL: Social Change.

- Government of West Bengal. (2013). Kanyashree Prakalpa: Operational Guidelines. Kolkata, WB: Department of WCD&SW.
- Guha, R. (2007). India After Gandhi: The History of the World's Largest Democracy. London, UK: Macmillan.
- IIPS & ICF. (2021). National Family Health Survey (NFHS-5), West Bengal Report. Mumbai, MH: IIPS.
- Jain, D. (2016). Women's Quest for Power: Five Indian Case Studies. New Delhi, DL: Vikas Publishing.
- Khatun, N. (2019). Economic Contribution of Girl Child in Bidi Industry. Bangkok, Thailand: Gender, Technology and Development.
- Maitra, S. (2019). Education and Gender: Tracking Kanyashree's Success. New Delhi, DL: National University of Educational Planning.
- Mazumdar, V. (2012). Education & Social Change: Three Studies on Indian Women. Shimla, HP: IIAS.
- Mondal, R. (2020). The Role of Kanyashree in Rural Schools of Central Bengal. Kolkata, WB: Progressive Publishers.
- Mukherjee, P. (2022). Inter-departmental Coordination in Social Welfare Schemes. New Delhi, DL: Indian Journal of Public Administration.
- Mukhopadhyay, A. (2021). The Paradox of Progress: Child Marriage Trends in Bengal Post-COVID. Hyderabad, TS: Journal of Rural Development.
- Nussbaum, M. C. (2000). Women and Human Development: The Capabilities Approach. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Omvedt, G. (2005). Dalits and the Democratic Revolution. New Delhi, DL: Sage India.
- Pande, R. (2015). Child Marriage in India: Factors and Problems. New Delhi, DL: Serials Publications.
- Rahman, A. (2021). Migration and Social Vulnerability: A Case Study of Murshidabad. Leiden, Netherlands: Brill.
- Ray, K. (2020). Social Welfare and Women Empowerment in West Bengal. Kolkata, WB: Dasgupta & Co.
- Ray, N., & Bose, M. (2022). Regional Disparities in Policy Implementation: A Bengal Case Study. London, UK: Routledge.
- Sarkar, P., & Roy, D. (2022). Poverty and Persistence of Child Marriage: Field Observations. New Delhi, DL: Allied Publishers.
- Sarkar, S. (2020). Patriarchy and the Burden of Girl Child in Rural Bengal. New Delhi, DL: Indian Anthropologist.
- Sen, A. (1999). Development as Freedom. New York, NY: Alfred A. Knopf.
- Sen, R., & Ghosh, T. (2019). Impact of Sabooj Sathi and Kanyashree on Female Literacy. New Delhi, DL: Sage Spectrum.

- Sengupta, R. (2019). Social Transformation and Public Policy in West Bengal. Kolkata, WB: K.P. Bagchi & Co.
- Sethi, M. (2017). Women's Rights and Laws. New Delhi, DL: Akansha Publishing House.
- Standing, G. (2011). The Precariat: The New Dangerous Class. London, UK: Bloomsbury Academic.
- Thapar, R. (2014). The Past as Present. New Delhi, DL: Aleph Book Company.
- UNICEF. (2018). Ending Child Marriage: A Profile of Progress in India. New York, NY: UNICEF Data and Analytics Section.
- UNICEF. (2021). COVID-19: A threat to progress against child marriage. Kathmandu, Nepal: UNICEF ROSA.
- Venkatesh, V. (2016). Bridging the Gender Gap in Rural India. Singapore: Springer.
- World Bank. (2020). Economic Impacts of Child Marriage: Global Trends. Washington, DC: World Bank Publications.

Citation: **Sultana. Z.,** (2026) "নীতিমালা থেকে বাস্তবায়ন: পশ্চিমবঙ্গে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সরকারি প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা মূল্যায়ন (মুর্শিদাবাদ জেলার বিশেষ দৃষ্টান্তসহ)", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-4, Issue-03, March-2026.